

পরীক্ষা-সম্রাসের মুখে শিক্ষাব্যবস্থা

জী ব নের সাইকেল

মামুনুর রশীদ

কিছুদিন আগে গ্রামের এক হাইস্কুলে গুটিং করতে গিয়েছিলাম। ক্লাস চলছিল। স্কুলের এক উদ্যোগী শিক্ষক আমাকে আবিষ্কার করলেন অভিনেতা হিসেবে নয়, সপ্তম শ্রেণিতে পাঠ্য একটি নাটকের লেখক হিসেবে। প্রায় জোর করেই তিনি আমাকে সপ্তম শ্রেণির ক্লাসে নিয়ে গেলেন। ছাত্ররা আমাকে পেয়ে একটু পুলকিত হলো। কিন্তু যেই বলা হলো আমি পাঠ্য নাটকটির লেখক, তখন আস্তে আস্তে চোখের আলোটি নিভে যেতে লাগল। আমি ভেবেছিলাম ছাত্রদের চোখে-মুখে কৌতূহল দেখতে পাব। নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত হব। কিন্তু মনে হলো আমি যেন অপরাধী। ভাবটা এ রকম: বেশ নাটকটা লিখে আমাদের ঘাড়ে চাপাল বাটা। মুখস্থ করতে হয়, প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, যার জন্য ছুটতে হয় কোচিং সেন্টারে।

অজানাকে জানা এবং আবিষ্কার করার এক মহান প্রচেষ্টার নাম শিক্ষা। মানবজাতির যাবতীয় অতীত, অতীতের আবিষ্কার, মহান সব মানুষের পদচিহ্ন দেখে দেখে নিজেকে মহত্তর জীবনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষা। শিক্ষা এক আনন্দময় শ্রম। এই আনন্দ থেকেই সৃজন। কিন্তু এখন শিক্ষা কঠোর শ্রম, আনন্দহীন দিবস-রজনী, অর্থ ব্যয় এবং বাণিজ্যের উপায়।

শিশু কীভাবে নিজের চেয়ে দুই গুণ ওজনের ব্যাগ নিয়ে ছুটেছে স্কুল নামে এক কারাগারের দিকে। স্কুল থেকে ফিরেও মুক্তি নেই। পাঁচ-ছয়জন শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষা-যুদ্ধ। ক্লাস-অবসর দেহে পরদিন সকালের জন্য প্রস্তুতি। এর মধ্যে সময় পেলেই মন পড়ে থাকা ভিডিও গেমস, ইন্টারনেটে চোখ বোলানো। সকালের সবুজ পাতার ওপর বৃষ্টির ফোঁটা কেমন লাগে, তা দেখার উপায় নেই। কোনো পাখির শব্দ বারবার শোনার কোনো আগ্রহ নেই, আকাশের কতবার রং বদলায় তা দেখে একটু পুলক অনুভব করা যাবে না, স্কুলের ঘণ্টা বাজবে, উপস্থিত হতে হবে কোচিং সেন্টারে। সামনেই পরীক্ষা, অসংখ্য পরীক্ষার চাপ। শিক্ষা যেহেতু বুদ্ধিতে রূপান্তর হয়নি, ভাবনার কোনো অবকাশ নেই, তাই তাতে স্বপ্নের আলোকিত মানুষ হওয়ার উপায় থাকে না।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে শিক্ষার একটা জোয়ার এসেছিল। ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলে বলত শিক্ষা হচ্ছে দেশসেবার জন্য। শিক্ষক থেকে দোকানদার—সবাই দেশসেবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু সেখানেও যে কী হয়ে গেল—চল্লিশ দশক থেকে ধর্ম হয়ে গেল জাতি আর দ্বিজাতিতন্ত্র মাথা খেয়ে ফেলল মানুষের। ধর্মের উদ্ভাদনা নিয়ে দুই ধর্মের মানুষ একে অপরকে হত্যা করল। একটা দেশের মানুষ কী শান্তিতে শত শত বছর কাটিয়েছে, যুদ্ধবিগ্রহে নিজেদের মধ্যে কিছু হয়নি। তাহলে ওই সময় কি শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা ছিল? হয়তো ছিল। সে ক্ষেত্রে একটা বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা তো ছিলই।

তারপরেও দেখা যায় আলোকিত মানুষ অনেক। উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করবে, তা পারল না। প্রতিবাদটা এল ছাত্রদের মধ্য থেকেই। সামরিক আইন এল, তার প্রতিবাদও ছাত্রদের কাছ থেকেই। ছাত্ররা তখন শুধু পড়ে না, প্রতিবাদ করে, আন্দোলন রচনা করে, আবার ছাত্র হিসেবেও মেধাবী। সৃজনশীল নানা কাজেও তারা যুক্ত। তারপর পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল সোচ্চার হয়ে একটি সশস্ত্র যুদ্ধের দিকে নিয়ে গেল। দেশ স্বাধীন হয়ে গেল।

স্বাধীনতার পর শিক্ষার নতুন রূপের খা এল না। বহুমুখী শিক্ষার প্রসার হলো। ইংরেজি স্কুল, সরকারি স্কুল, মাদ্রাসা—সবকিছুর প্রসার। একদিকে সবস্তরে বাংলা, অন্যদিকে সামরিক শাসনের সময় একেবারে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা। বাংলার কোনো স্থান নেই। নতুন নতুন পাঠ্যসূচি এসে শিক্ষাকে

ভারী করে দিল। ছাত্রদের বই হাত থেকে ঘাড়ে, পরে পিঠে গিয়ে উঠল। নোজা মেরুদণ্ড গেল বেকে। আসলেও শিক্ষার মেরুদণ্ড গেল হেলে। শিক্ষা মানে পরীক্ষা। ছাত্রের পরিমাপ নয়, জ্ঞান নয়, সৃজনে নয়। একদা পরীক্ষা ছিল পবিত্র এক উৎসব, আত্মপরীক্ষার একটা সুযোগ। তারপর পরীক্ষায় এল নকলের মহোৎসব। এখন পরীক্ষা মানে সম্রাস।

পরীক্ষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ নেই। আবার কোন পরীক্ষা আসে কে জানে? প্রাথমিক শিক্ষায় যত বই, শিক্ষক তত নয়। শিক্ষক তাই শিক্ষা দানে আগ্রহী নয়। আগ্রহী নগদ টাকায়, স্কুলের আগে আর স্কুলের পরে ভাবে কীভাবে টাকা কামানো যায়, সেই দিকে। ইংরেজি স্কুলে এই চাপ আরও বেশি, পয়সাও বেশি। ধনী লোকের দল টাকা দিয়ে শিক্ষা কিনতে আগ্রহী, মানুষ তৈরির জন্য নয়। জাতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য তা তার চর্চার মধ্যেই নেই। এর মধ্যে কত কিছু ঢুকে যায়। মাদক, সম্রাস—কত কিছু!

ছাত্রদের সমাবেশে, অনেক দিন ধরে দেখতে পাই অস্ত্রের বানবানানি। সেসবের ছবিও আমরা দেখতে পাই মিডিয়ায়। একই দলের দুই পক্ষের মধ্যেও এসব চলছে। ধর্ম নিয়ে সংগঠিত কিছু গোষ্ঠীর বাড়িবাড়ি দেখা গেছে অনেক দিন ধরেই। শিক্ষাব্যবস্থার কানাগলি দিয়ে এসবও ঢুকে পড়েছে। ধর্ম নিয়ে যারা রাজনীতি করেছে, তারাই গোপনে মাদ্রাসাকে ব্যবহার করেছে। এখন তা ঢুকে গেছে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চবিত্তের মধ্যেও। শিক্ষার মধ্যে যে সুকুমার বৃত্তি নির্মাণের প্রক্রিয়াটি থাকে, তা ইতিমধ্যেই থমকে গেছে।

শিক্ষাকে অত্যন্ত জরুরিভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। আর এ বিষয়টি শুধু সরকারের ওপর ছেড়ে দিলেই চলবে না। শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিকর্মী, ছাত্রসংগঠন সবাই একত্র হয়েই আন্দোলন করা উচিত। একদা শরিফ কমিশন বাতিলের দাবিতে ছাত্ররা প্রাণ দিয়েছিল। মজিদ খানের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধেও ছাত্র ও বিদ্বজ্জন প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু আশ্চর্য, সেটি নাকি গোপনে কার্যকরও হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের পাঠ্যবইয়ের ওপর যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল, হয়তো তিনি সেই পাঠ্যসূচিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। আজকের দিনে তাই জাতিকে রক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষার বিষয়টিকে জরুরিভাবে গণচেতনায় নিয়ে আসা প্রয়োজন।

শিক্ষা যেহেতু
বুদ্ধিতে রূপান্তর
হয়নি, ভাবনার
কোনো অবকাশ
নেই, তাই তাতে
স্বপ্নের আলোকিত
মানুষ হওয়ার
উপায় থাকে না